(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

ARJMD

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL VOLUME - 74 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

JUNE 2022

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION
Specialized in academic publishings only
www.journalresearchijf.com

সাম্প্রদায়িকতা ষড়যন্ত্র- দেশভাগ

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

ISSN : 2456-1045 (Online)
ICV Impact Value: 74.80
GIF- Impact Factor: 5.194
IPI Impact Factor: 3.56
Publishing Copyright @ International Journal Foundation
Article Code: HIS-V74-I1-C2-JUN-2022
Category : HISTORY
Volume : 74.0 (JUNE-2022 EDITION)
Issue: 1(One)
Chapter : 2 (Two)
Page : 05-12
Journal URL: www.journalresearchijf.com
Paper Received: 27th JUNE 2022
Paper Accepted: 17th JULY 2022
Date of Publication: 31st JULY 2022
DOI: 10.5281/zenodo.6949211

NAME OF THE AUTHOR

Rebati Ranjan Ojha

Assistant Professor ,
Panchthupi Haripada Gouribala College ,
Panthupi, Murshidabad,
West Bengal, India

ABSTRACT

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা ভারতবাসী দীর্ঘ ২০০ বছরের বিদেশী আপশাসন থেকে মুক্ত হলাম। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্তমিত হয়না'- ইংরেজদের এই দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হল। স্বাধীন হল ভারতবর্ষ, সঙ্গে বিভক্ত হল দেশ। অবশ্য ব্রিটিশরা আমাদের কাছ থেকে একটিমাত্র দেশ অধিকার করতে পেরেছিল, আমরা তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলাম দুটি দেশ। এটা নেটিভ ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কাছে কম কৃতিতের নয়। অবশ্য এটা ভারতীয়দের প্রতি সভ্য ইংরেজদের উপহারও হতে পারে। যদিও আমরা সাধারন ভারতবাসী কখনো এই উপহার চাইনি, চেয়েছিলাম স্বাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষ। তাহলে কেন ভারতবর্ষ খণ্ডিত হল? শুধুই কি ধ্রুত ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, না তৎকালীন ভারতীয় নেতাদের নির্বুদ্ধিতা, হঠকারিতাও এর জন্য দায়ী ছিল। অবশ্যই তৎকালীন ভারতের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কমবেশি দায়ী ছিল, সে আলোচনায় পরে আসছি। তবে দেশভাগের পরিনতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বাস্তুচ্যুত হয়ে উদ্বাস্তু জীবনযাপন– যা কিন্তু ২০০ বছরের ব্রিটিশ অপশাসনকেও হার মানিয়েছিল।

সাংকেতিক লিপি : জাতীয় কংগ্রেস, দেশভাগ, মুসলিম লীগ, সাম্প্রদায়িকতা, ষড়যন্ত্র।

CITATION OF THE ARTICLE

Ojha R.R. (2022) সাম্প্রদায়িকতা ষড়যন্ত্র- দেশভাগ; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries;* 74(2) pp.05-12

* *Corresponding Author*

I. INTRODUCTION

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ জয়ের ফলে সেই সাম্রাজ্য ইমারতের আকারে পরিনত হয়। তারপর ভারতবাসীর অজ্ঞতা ও অন্তরদ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে সেই ইমারতকে আরও প্রায় ১০০ বছর টিকিয়ে রাখে। যদিও ব্রিটিশের ইমারত সাম্রাজ্যকে ভারতবাসী ভেঙে ফেলার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু কূটকৌশলের মাধ্যামে তারা ভারতবাসীর সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করে ভারতবাসীর দ্বন্দ্বকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। তবে এ কৃতিত্ব শুধু ব্রিটিশের নয়, এ কৃতিত্ব তৎকালীন ভারতের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের, এ কৃতিত্ব ভারতবাসী তথা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার।

ভারতে মুসলিম লীগ (১৯০৬ খ্রিঃ) জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫ খ্রিঃ) অনেক পরে প্রতিষ্ঠা হলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তারা জাতীয় কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল, বা বলা যায় কংগ্রেস থেকে তারা অনেকটা এগিয়ে ছিল। অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ মুসলিম লীগের হাত ধরে নয়, তার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৈয়দ আহম্মদ খানের হাত ধরে। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করেন। তবে জীবনের প্রথম দিকে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তিনি হিন্দু- মুসলিম ঐক্যের উপর জোড় দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে "হিন্দু- মুসলিম ছিল এক জাতি, একই জননীর দুই সান্তান"- "ভারত মাতার দুই চক্ষু" যার একটিতে আঘাত লাগলে অন্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১] এছাড়া বাঙালীদের সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বাঙালীদের "ভারত মাতার মুকুট"[২] বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৮৪ সালে তিনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "আপনারা কি এই দেশে বাস করেন না? এখানেই কি আপনাদের কবর দেওয়া হয় না? আপনারা এই দেশেই জীবনধারণ করেন, এখানেই মরেন।"[৩]

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁর এই হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মোহ ভেঙে যায় এবং ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁরই হাত ধরে সাম্প্রদায়িকতার পথ চলা শুরু হয়। যার মুখে একসময় শোনা যেত হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা, এক জাতি; এখন তিনি প্রচার করতে লাগলেন 'হিন্দু– মুসলিম কেবল দুটি পৃথক জাতিই নয়- পরস্পর বিরোধী স্বার্থযুক্ত এবং যুদ্ধরত দুটি পৃথক জাতি।[৪] তাঁর কাছে কংগ্রেস ছিল "বাঙালী বাবুদের" স্বার্থে পরিচালিত একটি 'হিন্দু সংগঠন' এবং কংগ্রেসের আন্দোলন হল 'অস্ত্রবিহীন গৃহযুদ্ধ' ('a civil war without arms')। ১৮৮৪ সালের তাঁর আবেগ তাড়িত ভাষণ দ্রুতই পরিবর্তন হয় যখন ১৮৮৭ সালে লর্ড ডাফরিন জাতীয় কংগ্রেসকে প্রবল সমালোচনা ও আক্রমন করেন। সৈয়দ আহম্মদ ও সেই আক্রমনে সামিল হন। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে প্রশাসনিক পদে ও বিভিন্ন পেশায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। এককথায় মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ঘোষণা করেন, "ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের স্বার্থ ইংরেজরাই সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে।"[৫] সুতরাং মুসলমানদের উচিত সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর নীতি অনুসরন করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যান। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়, তখন তারা প্রকাশ্যেই সরকারের পক্ষ নিয়েছিল। এছাড়া যেসব মুসলমান এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল তাদেরকে প্রবল সমালোচনা করে বলা হয়েছিল তারা "ইসলামের জঘন্য বিশ্বাসঘাতক ও কংগ্রেসের দালাল।"[৬] ফ্রান্সিস রবিন্সন প্রমুখ মনে করেন যে, সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজ আন্দোলনের প্রভাবেই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[৭] যে লীগ ও তার নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে ভারতভাগের অন্যতম প্রধান কান্ডারী হয়ে উঠেছিল। যাই হোক এই আলোচনা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি ভারতীয় রাজনীতিতে সৈয়দ আহম্মদই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ও তাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে তারা সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি এবং বিভাজন ও শাসন নীতির আশ্রয় নেয়। ১৮৫৯ খ্রিঃ বোম্বের গভর্নর এলফিনস্টোন ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান নীতি ছিল 'বিভাজন ও শাসন

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

নীতি'। ভারতেও আমদের এই নীতি গ্রহন করা উচিত।[৮] ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জন লরেন্স (১৮৬৪-১৮৬৯ খ্রিঃ) পাঞ্জাবের সেনাবাহিনীতে 'বিভাজন ও শাসন' নীতি কার্যকরী করেন। ১৮৭১ খ্রিঃ প্রকাশিত W.W. Hunter –এর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থটি অনেক শিক্ষিত মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক করে তুলেছিল। যোগেশ চন্দ্র বাগেলের মতে, গ্রন্থখানি কিছুদিন পরেই মুসলিমদের কাছে আধুনিক কালের হাদিস বলে গণ্য হয়।[৯] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫খ্রিঃ) পর লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪ – ১৮৮৮ খ্রিঃ) মুসলিমদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন যে, এটি একটি হিন্দু সংস্থা। এছাড়া তিনি মুসলিমদের একথাও মনে করিয়ে দেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে মুসলিমদের পূর্বপুরুষরাই একসময় এদেশের হিন্দুদের জয় করে তাদের শাসন করেছেন ও বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ লর্ড ডাফরিন এইভাবে মুসলিমদের বর্ণনা দিয়েছেন, 'পাঁচ কোটি মানুষের এক জাতি', এদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এক, তাদের 'মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা যখন, দিল্লীর মসনদে বসে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তারা একচ্ছত্র শাসন চালাত।'[১০] লর্ড সলিসবেরি মুসলিমদের এক জনসভায় বলেন, বিরোধী সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উপর মুসলিমদের ভবিষ্যৎ অর্পণ করা ঠিক হবেনা। তিনি "শ্বেতাঙ্গদের বোঝা" (Whitman's burden) মতবাদ প্রচার করে ভারতীয়দের অযোগ্যতার কথা বলেন। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মতে, মুসলিমরা পৃথক নির্বাচনের কথা তখনও পর্যন্ত না বললেও সরকার স্বেচ্ছায় সেই সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহন করেছিল। ডাফরিনের পরামর্শে মুসলিমরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৮৮৭ খ্রিঃ ভারতসচিব লর্ড ক্রস ও যুক্তপ্রদেশের শাসক অকল্যান্ড কলভিন হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির জন্য ডাফরিনকে অভিনন্দন জানান। বাংলার ছোটোলাট বামফিল্ড ফুলার মুসলিম ও হিন্দুদের 'সুয়োরানী' ও 'দুয়োরানীর' সঙ্গে তুলনা করে সুয়োরানীর পক্ষে মত দেন।[১১] লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত (১৯০৫), পৃথক নির্বাচন সংক্রান্ত মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) এবং ১৯১৬ খ্রিঃ লখনউ চুক্তিতে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানকে মেনে নেওয়া হয়। এইভাবে বিভিন্নভাবে ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসননীতি' সাম্প্রদিকতাবাদকে উস্কানি দিয়ে গিয়েছিল। আর এরই পরিনাম ছিল ১৯৪৭ এর দেশভাগ।

সৈয়দ আহম্মদ খানের মৃত্যুর পর (১৮৯৮) আলিগড় কলেজের নতুন সভাপতি ভিকার- উল- মুলক ও তাঁর সহযোগী নবাব মহসিন- উল- মুলক আগের মতোই সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করেন। আর এ ব্যাপারে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ইন্ধন যুগিয়েছেন। মেহতা ও পট্টবর্ধন বলেন বেক সৈয়দকে জাতীয়তাবাদ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। লর্ড এলেনবরা ও এলগিন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত শাসন করেন। থিওডোর বেকের পর আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে থিওডোর মরিসন ও স্যার আর্চিবল্ড সাম্প্রদিকতায় উস্কানি দিয়েছেন। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, ব্রিটিশরা কিছু মুসলিমের সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের বিকল্প হিসাবে তাদের ব্যাবহার করতে চেয়েছিলেন।

এইভাবে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ১৯০৬ খ্রিঃ গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ, যেটিকে কাজে লাগিয়ে একদিন তারা ভারত ভাগ করতেও সক্ষম হয়। বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার আগে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে যান এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউন্ড ধার দিয়ে তাকে হাত করেন সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। কার্জন ঢাকাতে ভাষণ দেওয়ার সময় ঘোষণা করেন মুসলিমদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ রচনাই তাঁর লক্ষ্য।[১২] বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা সমর্থনের বিনিময়ে মর্লের অনুরোধে লর্ড মিন্টো ঢাকার নবাব সালিমুল্লাকে ১৪ লক্ষ টাকা সরকারী ঋণ দেন।[১৩] এরপর ১৯০৬ সালে সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা ও বঙ্গভঙ্গের প্রধান সমর্থক আগা খাঁ ৩৫ জন উচ্চবিত্ত মুসলিমদের নিয়ে সিমলায় বড়োলাট মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে সিমলা ডেপুটেশান দেন, যেটা মুসলিম লীগ গঠনের চূড়ান্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ঐ বছরই ৩০ শে ডিসেম্বের আগা খাঁর সভাপতিত্বে ঢাকায় 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা হয়। ফলে মুসিলদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি একে 'সালিমুল্লা' লীগ বলে অভিহিত করেছেন।[১৪]

ইতিমধ্যে আন্দলনের পদ্ধতি নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হয়। একটা শ্রেণী যারা কংগ্রেসের আদি প্রবক্তা, তাঁরা তাদের আন্দোলন আবেদন নিবেদনের

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। অন্যদল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। এই নিয়ে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭ খ্রিঃ) উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ চরমে পৌছায় এবং জাতীয় কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন ব্রিটিশ এবং মুসলিম লীগ উভয়কেই যেন স্বস্তি দেয়। সুরাট ভাঙনের পরে লর্ড মিন্টো মর্লেকে লেখেন, 'কংগ্রেসের পতন আমদের পক্ষে একটা বড় জয়।[১৫] সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে যেন লর্ড কার্জনের স্বপ্ন পূরণ হল। কারন ১৯০০ সালের ১৮ ই নভেম্বর কার্জন ভারতসচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার সবচেয়ে বড় কাজ হবে তার শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা।[১৬]

ইংরেজদের বিভাজন ও শাসন নীতি আরও প্রকট হয় ১৯০৯ সালের মর্লে- মিন্টো শাসন সংস্কার আইনে। কারন এই আইনে মুসলিমদের স্বার্থে পৃথক নির্বাচন নীতি গৃহীত হয়। মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে এর আগে ১৯০৬ খ্রিঃ ইংল্যান্ডের হাউস অব লর্ডস এ মর্লে ঘোষণা করেছিলেন– ভারতীয় মুসলমানরা শুধুমাত্র একটি পৃথক ধর্ম অনুসরণ করেন তা নয়, সামাজিক আচরন ও জীবনযাত্রার দিক দিয়ে তাঁরা একটি পৃথক জাতির সমতুল্য।[১৭] মর্লে ও মিন্টো ভারত শাসনের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি গ্রহন করেন। দমননীতি, চরমপন্থীদের থেকে নরমপন্থীদের পৃথক করা; আর এই উদ্দেশ্যে নরমপন্থীদের কিছু কিছু সুযোগ- সুবিধা দেওয়া এবং বিভেদ ও শাসননীতির সসাসরি প্রয়োগ। মর্লে- মিন্টো আইন ছিল তৃতীয়টির সর্বোত্তম উদাহরণ। 'বঙ্গভঙ্গ একটি স্থায়ী ঘটনা' মর্লের এই ঘোষণা যদিও তাঁর অনুরাগী ভারতীয় নরমপন্থীদের কিছুটা হতাশ করেছিল। তারপর অবশ্য তিনি নরমপন্থী নেতা গোখলের সঙ্গে ফলপ্রসূ কিছু আলোচনা করে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এবার আসা যাক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থান প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মুসলিম লীগ ও মুসলমানদের গোঁড়া মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারন, ইংরেজ শাসকদের মুসলিম তোষণ নীতি পরোক্ষভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহারের চেষ্টা, এবং জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ও আপোষ নীতি একশ্রেণীর হিন্দুদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে লালচাঁদ ও ইউ. এন. মুখার্জি ১৯০৯ সালে পাঞ্জাবে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের অভিযোগ ছিল, মুসলমানদের তোয়াজ করতে গিয়ে কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে।[১৮] অনেকে স্বামী দয়ানন্দের ভাবধারা ও কার্যকলাপের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ছায়া খুঁজে পেয়েছেন, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে তা ছিল অনেকটাই সৈয়দ আহম্মদ খানের প্রতিক্রিয়া। ১৯০৯ সালে পাঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লালা লাজপত রায় বলেন, "হিন্দুরা নিজেরাই একটি জাতি কারন তারা তাদের নিজস্ব বিশেষ ধরনের একটি সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে"।[১৯] তাই বলা যায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা শুধু সৈয়দ আহম্মদের মধ্যেই নয়, হিন্দু নেতা লালা লাজপত রায়ের ভাষণেও ছিল।

১৯১৫ সালে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় মদনমোহন মালব্যর উদ্যোগে সারা ভারত হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। তবে ১৯১৫ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই সংগঠন নামমাত্রই সক্রিয় ছিল। কিন্তু ১৯২২- ২৩ সাল থেকে হিন্দু মহাসভা সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভার বারাণসী অধিবেশনে স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজের রীতি অনুসারে "শুদ্ধি আন্দলনের" কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং হিন্দু আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের ডাক দেওয়া হয়। এই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মদনমোহন মালব্য, বিনায়ক দামোদর সাভারকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ আপ্রাণ চেষ্টা করেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯২৫ সালে, যখন কে. বি. হেডগেওয়ার নাগপুরে আর. এস. এস বা "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এর সদস্যরা ছিল ভারতের ঐতিহ্য অনুরাগী, দেশপ্রেমী ও প্রতিবাদী স্বভাবের। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষা করা। ১৯২৭ সালে এই সংগঠনের নামকরণ হয়েছিল রামনবমীর দিন, কারন ঐ দিনটি সাধারনভাবে রামের জন্মদিন হিসাবে পালন করা হয়। একই দিনে সংগঠন গেরুয়া পতাকা বা 'ভাগওয়া ঝাণ্ডা' গ্রহন করে এটি রামের পতাকা এই বিশ্বাস থেকে। সুতরাং জন্মলগ্ন থেকেই আর. এস. এস রামের

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

কাহিনীকে নিজেদের মতাদর্শ ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করার কাজে লাগিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই সংগঠনের আদর্শ ও প্রচার হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করেছিল। এম. এস. গোলওয়ালকর আর. এস. এসের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। ১৯৩৯ সালে তিনি ঘোষণা করেন সংখ্যালঘুদের দাবি মেনে নেওয়া হলে 'হিন্দু জাতীয় জীবন ধ্বংস হওয়ার বিপদ দেখা দেবে'।[২০] গোলওয়ালকর কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদীদেরও হিন্দুদের শত্রু বলে মনে করতেন। এছাড়া তিনি মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হিন্দুস্তানের হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে ও এই ধর্মের মাহাত্মকে হৃদয়ে স্থান দিতে পরামর্শ দেন। এইভাবে দেখা যায় যে, হিন্দু মহাসভা ও আর. এস. এসের বিভিন্ন কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এবার ১৯৩০-৪০ এর দশকের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক। এই সময়ের রাজনীতি মানেই জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সাথে মুসলিম লীগ, আলি জিন্না, সাম্প্রদায়িকতা, লাহোর প্রস্তাব, পৃথক রাষ্ট্র ইত্যাদি। জিন্নার প্রসঙ্গে বলা যায় সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে। সৈয়দ আহম্মদের মতো তিনিও কর্মজীবনের প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ১৯০৬ সালে ওকালতি পাস করে যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন ধর্মনিরপেক্ষ, উদারনৈতিক, ও জাতীয়তাবাদী নেতা দাদাভাই নৌরজীর অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯০৬) তিনি দাদাভাইয়ের সচিব হিসাবে কাজ করেন। এমনকি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি আগা খাঁ জিন্নাকে লীগের সবচেয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] ভারতের নাইট অ্যাঙ্গেল সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী আলি জিন্নার ধর্মান্ধ হতে বিশেষ সময় লাগেনি। ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লিগে যোগদান করেন। যদিও তখনো তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেননি এবং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাওলাট বিল পাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করে তিনি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২০- র দশক থেকে তিনি ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯২৮-২৯ সালে আগা খাঁ এবং এম. শফির মত সাম্প্রদায়িক নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী মতাদর্শে বেশী আগ্রহী- এটা লক্ষ্য করে জিন্না কিছুটা বিভ্রান্ত ও দিকভ্রষ্ট হয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেলেন। দেহটা ইংল্যান্ডে থাকলেও মনটা ছিল ভারতের মুসলমান ও মুসলিম লীগের জন্য। তাই হৃদয়ের টানে সাড়া দিয়ে ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লিগকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে হাত দেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার আহ্বান করেন। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি লাহোরে ঘোষণা করেন যে, 'আমি যাই করিনা কেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যেদিন আমি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছিলাম সেদিন থেকে আমার কোন পরিবর্তন হয়নি,এতটুকুও না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত আমি ভুল করেছিলাম। কিন্তু কখনো কোন গোষ্ঠীর সমর্থকের মনোভাব নিয়ে তা করিনি। দেশের কল্যাণই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, ভারতের স্বার্থই আমার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কোন কিছুই এ থেকে আমাকে একচুলও সরাতে পারবে না।'[২২] তবে বলা যায় এ সবই ছিল জিন্নার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও চাতুরতা মাত্র।

জিন্না নিজেকে অসাম্প্রদায়িক প্রমান করার জন্য আপ্রান মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি এক ঘোষণায় বলেন, উর্দু ভাষা ও লিপি সংরক্ষণ ও প্রসার এবং সাধারনভাবে মুসলিমদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহনের দাবিই ছিল একমাত্র মুসলমানদের দাবি। কিন্তু জিন্নার এই চাতুরতার নীতি বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে তিনি কট্টর সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহন করেন। ঘৃণা ও ভয় ছিল তাঁর এই রাজনীতির মূল বিষয়। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব সৃষ্টি করে তিনি বলেন, কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা চায়না- তারা চায় ব্রিটিশদের সহযোগিতায় হিন্দু রাজ কায়েম করতে,

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

মুসলমানদের উপর আধিপত্য করতে; এমনকি তাদের নিশ্চিহ্ন করতে, আর ভারতে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করতে।[২৩] একই সঙ্গে 'ইসলাম বিপন্ন' এই স্লোগান তুলে জিন্না উলেমাদের সাহায্যে জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করেন। যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লিগের সদস্যসংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে যায় এবং তিনি নিজেকে মুসলিম সমাজের একমাত্র মুখপত্র হিসাবে তুলে ধরতে থাকেন। এই সময় থেকেই কংগ্রেসী নেতারা জিন্নার সঙ্গে আপসের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু জিন্নার একরোখা মনোভাবের জন্য কোন আলোচনাই কার্যকর হয়নি। তবে আপস আলোচনা শুরু করার জন্য জিন্না এক উদ্ভট, অবাস্তব শর্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথমে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বাতিল করবেন এবং কংগ্রেসকে একতা হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংস্থা বলে ঘোষণা করবে আর মুসলিম লিগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মেনে নেবেন। বলাবাহুল্য ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা।

আলি জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এখানেই থেমে থাকেনি। ১৯৩৭ সালে লিগের লখনউ অধিবেশনে তিনি সরাসরি সমগ্র মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। মহাত্মা গান্ধী জিন্নার এই আহ্বানকে 'প্রায় যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন।[২৪] এছাড়া কংগ্রেসকে বর্নহিন্দুদের ফ্যাসিস্ট সংগঠন বলে অভিহিত করে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের সংগ্রামকে ইসলাম ও কাফেরের সংগ্রাম হিসাবে চিত্রিত করা হয়। আলি জিন্নার এই ধরনের কার্যকলাপ কংগ্রেসকে চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু জিন্নার সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে বিফল হন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ড ভারতবাসীর কোন মতামত না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। এতে উৎসাহিত হয়ে জিন্না সারা ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মুক্তি দিবস পালনের আহ্বান জানান এবং লীগ ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর মুক্তি দিবস বা নিষ্কৃতি দিবস পালন করে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ইতিপূর্বে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক মহম্মদ ইকবাল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান– এই চারটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল একত্র করে ভারতবর্ষের মধ্যেই ইসলামের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত ভূখণ্ড গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[২৫] ইকবালের এই ধারনা আরও প্রসারিত করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবী মুসলিম ছাত্র চৌধুরী রহমত আলি। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা ১৯৩৩সালে 'Now or Never' শীর্ষক চার পাতার এক পুস্তিকায় ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি প্রদেশ– পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। কোনো মুসলিম নেতাই তখন এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেননি, বরং এই প্রস্তাবকে 'ছাত্রের স্বপ্ন' এবং 'অসার অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দেন।

এদিকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য জিন্নাকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করে। যার ফলে তিনি আরও উগ্র হয়ে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াৎ খান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং আসামের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শায়াদুল্লা মুসলিম লীগে যোগদান করেন, যার ফলে লীগের শক্তি বহুগুন বৃদ্ধি পায়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনীতি জটিল আকার ধারন করলে, সেই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে জিন্না ও মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্না সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন, মুসলমানরা একটা জাতি। তাদের নিজস্ব বাসস্থান, নিজস্ব এলাকা এবং নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা উচিত।[২৬] ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ জিন্না ও লীগ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহন করেন। এই প্রস্তাবই বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

পরবর্তীকালে এটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেই পরিচিত হয়। যে মানুষটি (জিন্না) একসময় 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন, তিনিই শেষপর্যন্ত তুলেছিলেন পাকিস্তানের দাবি। সাম্প্রদায়িকতা যে কত ভয়ংকর হতে পারে জিন্নার কার্যকলাপ ছিল তার বাস্তব উদাহরণ।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবাসীর সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে দূত হিসেবে ভারতে পাঠায়। কিন্তু প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার উল্লেখ না থাকায় এবং ভারত বিভাগের পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকায় ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়। এই মিশনের ব্যর্থতার চূড়ান্ত পরিণতি হল ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ডাক দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকারও প্রচণ্ড দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন দমন করেন। এদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ ও ১৯৪৬ এর নৌ- বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে। এই পরিস্থিতিতে বড়োলাট ওয়াভেল তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করেন, যদিও জিন্নার একগুঁয়েমি মনোভাবের জন্য তা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ এর মার্চে তিন সদস্যের মন্ত্রী মিশন ভারতে পাঠান। অনেক দর কষাকষির পর লীগ এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নেয়। প্রথমে রাজী না হলেও পরে কংগ্রেস মিশন প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে সম্মত হয়, কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। বড়োলাট ওয়াভেল ১২ আগস্ট নেহরুকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানালে উত্তেজিত মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। বাংলার হোসেন শহীদ সুরাবর্দি পরিচালিত মুসলিম লীগ সরকার ও সরকারি মদতপুস্ট গুণ্ডাদের সহযোগিতায় ১৬ই আগস্ট থেকে তিনদিন কলকাতার বুকে ব্যাপক দাঙ্গা, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। ইংরেজ সম্পাদিত স্টেট্সম্যান পত্রিকা এই ঘটনার জন্য সরাসরি লীগ মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দিকে দায়ী করে। পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাবেও একই ঘটনা ঘটে।

এই অবস্থায় ক্লিমেন্ট এটলির ঘোষণা মতো ১৯৪৭ এর ২৪ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়োলাট হয়ে আসেন। বহু চেষ্টা করেও তিনি ভারত বিভাজনকে আটকাতে পারেননি। অবশেষে ৩রা জুন তিনি ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস দেশ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করলেও দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত তারা এই প্রস্তাব মেনে নেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও জিন্না সম্পূর্ণভাবে খুশি হতে পারেননি, কারন তিনি সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কতরে চেয়েছিলেন। তাই মাউন্টব্যাটেন ঘোষিত পাকিস্তানকে 'বিকলাঙ্গ ও কীটদগ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেও তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। অবশেষে ১৯৪৭ এর ৪ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা' আইন পাস হয় এবং ১৮ই জুলাই সেটি রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে। এরপর ১৫ই আগস্ট আসে সেই শুভক্ষণ যখন ভারতবাসী তাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করে। অবসান ঘটে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ অপশাসনের। তবে ভারত স্বাধীনতা পেলেও তার পরিণাম যে ভালো হয়নি ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। স্বাধীনতার পরিণাম যেটা হয়েছিল সেটা ইংরেজদের অপশাসনকেও হার মানিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল ভারত বিভাগ কি অনিবার্য ছিল? কোনোভাবে কি দেশভাগ এড়ানো যেত না? হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মধ্যে দিয়েই তো সুচতুর কার্জনের বাংলা ভাগকে (১৯০৫) রুখে দিয়েছিল বাঙালী। তবে স্বাধীনতার সময় তা আর একবার সম্ভব হয়নি কেন? ধর্মীয় বিভেদ থাকলেও ভারতবাসী দীর্ঘদিন একসাথেই বসবাস করে এসেছে। সাধারন মানুষ তো দেশভাগ চায়নি। তারাতো দেশভাগের জন্য প্রস্তুত ছিলনা এবং অন্তর থেকে তাঁরা তা মেনে নিতেও পারেনি। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহলে কেন ভারতবর্ষ ভাগ হল?

প্রচলিত ধারনা হল মহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লীগ ভারত ভাগের জন্য দায়ী। জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব, অনমনীয় , আপোষহীন, একরোখা নীতি ভারতবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এটা ঠিক যে, দেশভাগের জন্য জিন্না অনেকটাই দায়ী ছিল। কিন্তু শুধু জিন্না একা নয় এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রও কম দায়ী ছিলনা। কারন

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

মুসলিমরা যখনই কংগ্রেসের বিরোধীতা করেছে তখনই ব্রিটিশরা মুসলিমদের পক্ষ নিয়েছে। আবার এটাও ঠিক কংগ্রেসে নেহরু,প্যাটেলের যে গুরুত্ব ছিল জিন্নার ততটা ছিলনা। তাই জিন্নার রাগ করাটাই স্বাভাবিক। জিন্না তাই দেশভাগের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর কংগ্রেস নেতারাও বুঝে গিয়েছিলেন দেশভাগ অনিবার্য। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আই. সি. এস.-এর সদস্য পেন্ডেরেল মুন বলেছিলেন, 'ঐক্যবদ্ধ ভারতের সপক্ষে মুসলিমদের সম্মতি আদায়ের চেয়ে বিভক্ত ভারতের সপক্ষে হিন্দুদের সম্মতি আদায়ের সম্ভাবনা বেশী।'[২৭]

লর্ড মাউন্টব্যাটেনও ভারতের দায়িত্বভার নেওয়ার পর বুঝতে পারলেন যে, বেশীরভাগ কংগ্রেস নেতাই অবশেষে মেনে নিচ্ছেন দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী। যদিও দেশের ঐক্য অটুট রাখার জন্য জিন্নাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের প্রধান হবার প্রস্তাব দিয়ে গান্ধীজী মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জিন্না তাতে রাজী হয়নি। তাছাড়া এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সম্মতি ছিলনা।[২৮] তাই বলা যায় জাতীয় কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা, জিন্নার একরোখা মনোভাব ও ব্রিটিশের চাতুর্যতা– এ সবকিছু মিলিয়ে ভারত ভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই এ প্রসঙ্গে বোধহয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিশ্লেষণই সঠিক। তাঁর ভাষায়, " ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়, কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল, এটাও অনেকটা সত্য। ..... আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি, ইংরেজকেও না।"[২৯]

তথ্যসূত্র

[১] প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৫৭।

[২] জীবন মুখোপাধ্যায় ,আধুনিক ভারত, কোলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৯০

[৩] বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কম্পানী, কোলকাতা, ২০১৪ পৃঃ ৩৩১।

[৪] জীবন মুখোপাধ্যায় ,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০ ।

[৫] বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৩২।

[৬] তদেব, পৃঃ ৩৩২।

[৭] জীবন মুখোপাধ্যায় ও সুভাষ বিশ্বাস, ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস পৃঃ ১২৮।

[৮] প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮ ।

[৯] শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আধুনিক ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস, পৃঃ ১০১ ।

[১০] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কম্পানী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১৭ ।

[১১] সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ, কোলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৬৩৩।

[১২] অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃঃ৫৮।

[১৩] সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৫।

[১৪] শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭ ।

[১৫] অমলেশ ত্রিপাঠী,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫ ।

[১৬] অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম্পন্থী পর্ব, আনন্দ, কোলকাতা, ২০১২, পৃঃ ৬২-৬৩ ।

[১৭] প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খণ্ড),পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৬৬ ।

[১৮] সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রুপান্ত, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২০, পৃঃ ৪৩৫ ।

[১৯] সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫৫ ।

[২০] বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৯ ।

[২১] তদেব, পৃঃ ৩৪৫ ।

[২২] তদেব, পৃঃ ৩৪৭।

[২৩] তদেব, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮।

[২৪] শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ,আধুনিক ভারত(১৮৮৫-১৯৬৪), মিত্রম্, কোলকাতা, ২০২০, পৃঃ ২৯১।

[২৫] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশী থেকে পার্টিশান ও তারপর, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা ২০১৬, পৃঃ, ৪০৩।

[২৬] সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ, ৮৬৭।

[২৭] রামচন্দ্র গুহ, গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ, অনুবাদ আশীস লাহিড়ী, আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৬, পৃঃ, ২৫।

[২৮] তদেব, পৃঃ, ২৭।

[২৯] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্না পাকিস্তানঃ নতুন ভাবনা, ভূমিকা অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃঃ, ১২।

*****

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES